ঃ যোগাযোগ ঃ
প্রতাপদীঘি লোক বিজ্ঞান সংস্থা, পূর্ব মেদিনীপুর, শোভনলাল সাহু - ৯৭৩২৬৮১১০৬, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা- ৯৩৩২২৮৩৩৫৬

বিজ্ঞান অন্বেষক

ভিতরের পাতায়
পিঁপড়ের ভাব বিনিময়, চন্দ্রবোড়া সাপ, কোবিদার, ফ্রী-র দোলনায় দুলছি মোরা, বিজ্ঞান শিরোনামে।

বর্ষ-১৩ সংখ্যা - ১ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি RNI No. WBBEN/2003/11192 মূল্য : ২ টাকা

পাখিদের কথা

ব্ল্যাক বাজা

ব্ল্যাক বাজা Hawk জাতীয়, (Aviceda leuphotes) আকারে বেশ ছোটো এক ধরণের শিকারী পাখি। এরা 'Ciconiformes' order ভুক্ত ও 'Accipitridac' Family-র অন্তর্গত। গাত্রবর্ণে সাদা-কালোর অনবদ্য মিশেল ও মাথায় দীর্ঘ কালো ঝুঁটির (Crest) উপস্থিতি সহজেই রাজকীয়ত্ব প্রদান করে এই ব্ল্যাক বাজাদের। তাই প্রথমবার যখন অসমের 'মানস' জাতীয় উদ্যানে এদের দেখা পাই এই সাদা-কালোর বৈপরীত্যই সর্বাগ্রে চোখ টেনেছিল। সময়টা ছিল শীতের

এরপর 4 পাতায়

সোনার সন্ধানে

সোনা বর্তমান যুগে এত দুর্মূল্য বস্তু। আদিকালের প্রস্তরযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত যে জিনিষটি মানুষকে সব থেকে বেশি আকর্ষণ করেছে, সেটি অবশ্যই সোনা। স্বর্ণ যুগ বলতে এমন একটি সময় বুঝায় ইতিহাসে, যখন কোনো একটি দেশ বা জাতি তার উন্নতির চরম শিখরে ওঠে। সেজন্যই 'সোনা' শব্দটির সঙ্গে 'শ্রেষ্ঠত্ব' বা 'উৎকর্ষতা'র একটা সম্পর্ক থাকে। ধাতুর মধ্যেই শুধু শ্রেষ্ঠ নয়, ব্যবহারের দিক থেকেও সোনা অত্যন্ত প্রাচীন। প্রাচীন গ্রীকগাথাতেও সোনার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে আজ থেকে প্রায় বারো-তেরো হাজার বছর আগেও সোনার ব্যবহার ছিল।

এরপর 5 পাতায়

হারিয়ে যাচ্ছে পরিচিত মাছ

সব যেন বদলে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু। আজ যা দেখলাম কাল তা দেখব কিনা বলা মুস্কিল। বহু উদ্ভিদ প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। বিবর্তনে যারা প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না তারাই হারিয়ে যায়।

যেমন হারিয়ে গেছে 'ডাইনোসর', হারিয়ে গেছে অর্কিওপটেরিক্স ইত্যাদি প্রাণী। মাছেদের মধ্যে বিরল প্রজাতি, 'সিলাকান্থ'।

এভাবে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের পরিচিত মাছ সকল। বাঙ্গালীর পাতে

মোরলা মাছ

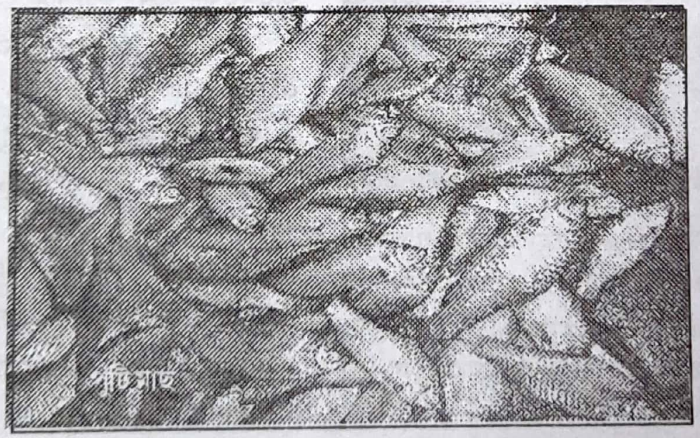

পুঁটি মাছ

ভাত-মাছ। তাইতো বলা যায় পুকুর ডোবায় মাছের সৃষ্টি মাছে ভাতে শরীর পুষ্টি।

ফিরে আসি মূল আলোচনায়—

বাঙ্গালীর পাতে মাছ আজ আকাল হয়ে পড়েছে। একে দুষ্প্রাপ্য, তার উপর দুর্মূল্য। নতুন নতুন প্রজাতির মাছ সৃষ্টি হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে হাইব্রিড

এরপর 2 পাতায়

কেন আপনি নুডল খাবেন না

তাৎক্ষনিক নুডল। সুস্বাদু। চটপট্ তৈরী। এমন কোনো খাদ্য কার না প্রিয় হবে। তবু এর উপর নিষেধাজ্ঞা। আবার নিষেধ-মুক্তি। বিভ্রান্তি বাড়ল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর উপর আলোকপাত করা যাক।

পরিপাকের ক্ষতি ঃ আপনি যদি ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তাৎক্ষনিক নুডল ঘন ঘন গ্রহণ করেন, অচিরেই আপনার পরিপাক ক্রিয়ার ক্ষতির সামনে পড়বেন। অনেকদিন ধরে এই খাদ্য গ্রহণে - কোষ্ঠকাঠিন্য পেটে ব্যাথা, অম্ল, পেট ফাঁপা, পাকস্থলীর সমস্যা দেখা দিতে পারে। কখনও কখনও পেট ভার ভার লাগবে।

উচ্চ রক্তচাপ ঃ নুডলে বেশী পরিমানে সোডি মানুষকে উচ্চরক্তচাপের রুগী বানাতে পারে। বৃক্ককে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। হাতে পায়ে জল জমে যেতে পারে। আগে থেকেই যাদের হৃদয় ও বৃক্ক দুর্বল ছিল, তাঁদের ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমান আরও বেশী।

নিম্নগামী বিপাক ঃ যদি আপনার দেহের বিপাকে ত্রুটি দেখা যায়, এটি আপনার ওজন বাড়িয়ে দেবে। নুডল দেহে বিষাক্ত পদার্থ জমা করে বিপাককে প্রভাবিত করে। যে কৃত্রিম রাসায়নিক বস্তুগুলো নুডলকে রঙচঙে করে, সুমিষ্ট গন্ধ দেয় তারাই শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক বিপাকের শত্রু হয়ে ওঠে। নুডলকে পচনের হাত থেকে বাঁচাতে সংরক্ষক পদার্থগুলোও এই বিনষ্টের যজ্ঞে সামিল হয়।

মনো সোডিয়াম গ্লুটামেট (MSG) অথবা আজিনা মটর ঃ নুডলের অপূর্ব স্বাদের তৃপ্তি MSG নির্ভর করে। গবেষণায় প্রমাণিত

এরপর 5 পাতায়

হারিয়ে যাচ্ছে পরিচিত মাছ

1 পাতার পর

মাছ। পরিচিত মাছ কোথায় গেল ? প্রশ্ন চিহ্ন। প্রশ্ন চিহ্নের মতই এর উত্তর বাঁকা। এই সকল মাছ শুধু বিবর্তনে খাপ খাওয়াতে পারেনি বলে হারিয়ে গেল না অন্য কোন কারণ এর পেছনে আছে।

কারণ খুঁজতে চলে যাই আমাদের অন্তর্দেশীয় পদ্ধতি, পুকুরে মিশ্র চাষ পদ্ধতিতে। পুকুরের জলের উপর ভাগে, মধ্য ভাগে ও তলদেশে মাটির কাছে মাছ থাকে। দেখা যাক, কোন স্তরের মাছ কমে যাচ্ছে বা হারিয়ে যাচ্ছে এবং কেন হারিয়ে যাচ্ছে।

তার পূর্বে বাজার থেকে ঘুরে আসি একবার। দেখে আসি দারি, মৌরলা, পাবদা, নেধস, বেলে, পুঁটি, চাঁদা প্রভৃতি মাছ বাজারে আর দেখা যাচ্ছে না। যদি যায়, তা অতি সামান্য। হারিয়ে যেতে বসেছে পৃথিবী থেকে। সব মাছই জলের ওপর স্তরের মাছ। মাঝের স্তরের মাছ-ফলি, বোয়াল ও ভেটকী হারিয়ে যাচ্ছে। দেহের গঠন ও মুখ বলে দেয় কোন স্তরের মাছ।

জল, খাদ্য ও তাপমাত্রা নির্ভরশীল সমস্ত জীবকূল। মাছও তাই। জল যদি বেশি উত্তপ্ত হয়/ বেশি ঠান্ডা হয়/যদি বেশি অম্ল বা ক্ষার হয়, যদি তাপমাত্রা বেড়ে (বর্তমান দিনে তাপমাত্রা $40^{0}C$) অত্যাধিক হয় এবং অক্সিজেনের ঘাটতি (জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন) দেখা দেয় তখন মাছেদের বেঁচে থাকা অনেক সময় সম্ভব হয় না। বর্তমান দিনে সালফার বৃষ্টি, অ্যাসিড বৃষ্টি প্রভৃতি ও কারখানার

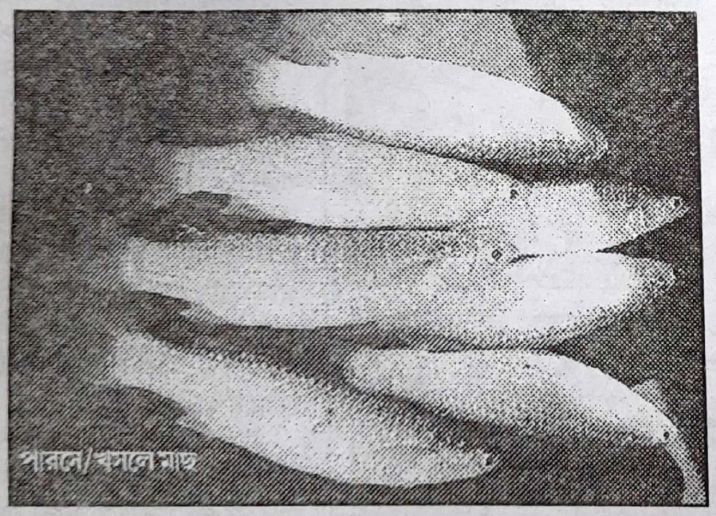

পারসে/খসলে মাছ

বর্জ্যপদার্থ জলে পড়ায় জলজ জীব হারিয়ে যেতে বসেছে। এছাড়া জলে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী যাদের Plankton বলা হয়, তাই হচ্ছে জলের উপরিভাগের মাছের খাদ্য। সব কিছুর এককথায় বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) বলা হয়। এগুলির পরিমিত পরিমান জীবের অস্তিত্ব ও বংশবিস্তারে প্রয়োজন। না হলে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েও ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হতে থাকে।

এছাড়া চাষ আবাদে যে রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারে করা হয় তা গড়িয়ে গিয়ে জলাশয়ে পড়লে সে মাছের মারাত্মক ক্ষতি করে এমন কী মৃত্যুও ঘটায় মাছ ও Plankton খাদ্যের।

পুকুরের ধারে বা কোন জলাশয়ের ধারে মাছরাঙা পাখি আর ছোঁ মেরে মাছ পায় না। মাছ থাকতেও পারে। তার উপর মাছরাঙা পাখিও বিপদগ্রস্ত, সার আর বিষে।

নিচের স্তরের মাছ শোল, ল্যাটা, কই, চ্যাং, শিঙ্গি, মাগুর, বাম, পাকাল প্রভৃতি মাছ মাটির কাছাকাছি থাকে। গায়ের রং কালো, একপ্রকার অনুকৃতি (Mimicry) যাতে শত্রুপক্ষের নজর না পড়ে। গায়ের ত্বকে এক প্রকার পিচ্ছিল পদার্থ, মিউকাস (Mucus), হড়হড়ে থাকে যা glycocalyx (Antimicrofial যুক্ত। এতে প্রোটিন ও শর্করা থাকে। জীবাণু আক্রমণ থেকে দেহ রক্ষা করে ও পিচ্ছিল হওয়ায় সহজে ধরাও পড়ে না। অগভীর জলাশয়ে যেখানে মাটিতে রাসায়নিক কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের অবশেষ থাকে তা নিচের স্তরের মাছের পিচ্ছিল পদার্থের ক্ষতি করে। জীবানু তখন দেহে আক্রমণ করে এবং মাছের দেহে ক্ষত সৃষ্টি করে আলসারে পরিণত করে যা বাজারে মাছে দেখা যায়। তারপর প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

সমস্ত স্তরের মাছের ত্বকে মিউকাস, পিচ্ছিল পদার্থ থাকলেও নানা রোগে মাছের মড়ক হয় ও মাছের শত্রুরা মাছকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে ফলে, মাছের সংখ্যা কমে।

পরিবেশের পরিবর্তন আর মানুষের দ্বারা দূষণ কিছু কিছু প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার কারণ।

মানুষ, আমরা ছোট ছোট মাছ, বড় মাছ যা পাই খাই আর বাজারে চালান করে দাম পাই। ফলে যা আছে তাও কমতে চলেছে।

পুকুর ডোবা ছেড়ে ব্রাকিস ওয়াটারে (লোনা জল) বাগদা আর সমুদ্রে মাছ চাষে মানুষ এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে সমুদ্রেও দূষণ চালিয়ে যাচ্ছি মানুষ আমরা।

হারিয়ে যাবে বহু পরিচিত অপরিচিত, দেখা - অদেখা বহু মাছ এমনি করে।

প্রকৃতি বিজ্ঞানী ডারউইনের মতে প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করতে করতে যারা টিকে থাকবে এবং কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে তারাই যোগ্য হবে। তার মতবাদ উল্লেখ করা যায় —

' Struggle for existence', 'Survival of the fittest', Origin of new species;.....

সমস্ত জীব কূলের পক্ষে এই মতবাদ উল্লেখ্য।

কিছুদিন পর হয়ত ছবি দেখিয়ে বলতে হবে— বেলে মাছ, দারি মাছ, পাবদা মাছ, ফলি মাছ, জলখা মাছ ইত্যাদি। হয়ত জীবাশ্ম বলবে এগুলি ছিল (যদি পাওয়া যায়)। তাই, Formalin বা Alcohol দিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা বিজ্ঞান সংস্থাদের নিতে হবে।

লেখক ঃ কানন কুমার প্রামানিক, নির্মলাশ্রম, মনোহরচক, কাঁথি।

মোঃ- ৯৪৩৪৩৬৯৬৬১

হারিয়ে যাচ্ছে যে সমস্ত মাছ

দারি, মোরালা, ফলি, বেলে (বালকুর), পুঁটি, পারসে/খসলা, চানদা, জলখা, পাকাল বাইস, শোল, মাগুর, গুল (চেঁওয়া), শিঙি, ল্যাটা, কই

ছবি ঃ গৌরীশঙ্কর বাগ ও কমল কুমার প্রামাণিক।

বিজ্ঞান শিরোনামে

১) ২০১৫ বর্ষটি "International year of light and light based technologies" ঃ সভ্যতার অগ্রগতিতে আলোর ভূমিকা এবং আলোক নির্ভর বিভিন্ন প্রযুক্তি আবিষ্কারের জন্য রাষ্ট্র সংঘ ২০১৫ সালটিকে আন্তর্জাতিক আলোক বর্ষ ও আলোক নির্ভর প্রযুক্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে।

২) মহাকাশে সৌরবিদ্যুৎ ঃ মার্কিন কল্পবিজ্ঞানী আইজ্যাক অ্যাসিমভ এর কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে চলেছেন চীনদেশীয় বিজ্ঞানীরা। মহাকাশে প্রায় ৬ বর্গকিলোমিটর জুড়ে যে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি তৈরী হচ্ছে সেখান থেকে মাইক্রোওয়েভ বিম এর মাধ্যমে পৃথিবীতে বিদ্যুৎ পাঠানোর ব্যবস্থা চলছে। মহাকাশে দিন ও রাতের সমস্যা থাকবে না বলে অফুরান বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে থাকবে।

৩) ভুট্টা থেকে জ্বালানী — ভুট্টার দানা, ঘোসা বা ছালের মধ্যে থাকা কার্বোহাইড্রেটকে ১০০শতাংশ হাইড্রোজেনে পরিণত করে মোটর গাড়ীর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে বলে মার্কিন তেল প্রস্তুতকারী সংস্থা 'শেল' জানিয়েছে।

৪) পরিবেশ বান্ধব সাইকেল — বেঁচে থাকার জন্য নির্মল প্রাণবায়ু নেওয়া যেমন মানুষের মৌলিক অধিকার আর তেমনি সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে পরিবেশ বান্ধব যানবাহনের নতুন নতুন আবিষ্কারও জরুরী। সেই রকম অবদান হল সৌরশক্তি চালিত যানবাহন। অতি সম্প্রতি চীনে বিশেষ ধরণের সাইকেল প্রস্তুত হয়েছে যার উপাদান বাঁশ গাছ যা কিনা সম্পূর্ণ ভাবে পরিবেশ বান্ধব।

৫) বাতাসে বাড়ছে বিষ ঃ যে যে কারণে ভারতে মৃত্যুহার বেশি তার মধ্যে অন্যতম পঞ্চম স্থান হল বায়ূদূষণ। সারা দেশের প্রায় ১৪১টি শহরের বাতাসে ভাসমান ধূলিকনার পরিমান নিরাপদ সীমা ছাড়িয়েছে। এদের মধ্যে ৯০টি শহরের দূষণের হার উঁচুমানের ও ২৬টি শহরের নির্ধারিত সীমার ৩ গুনেরও বেশি। নিম্নমানের জ্বালানির ব্যবহার ও গাড়ির সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি ও কলকারখানার নির্গত বিষাক্ত গ্যাস ছড়াচ্ছে বিষ। তাই সবার সুস্বাস্থ্যের কথা ভেবে বায়ূদূষণের হত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা এবং মানুষের নির্মল প্রাণবায়ু নেওয়ার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কাজে সবাইকে সচেতন করতে অগ্রনী ভূমিকা নিতে হবে।

৬) ভূমিকম্পের পূর্বাভাস ঃ কিছু প্রাণী বিশেষত ব্যাঙের উপর গবেষনা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে ভূমিকম্পের অন্তত ৮দিন আগে থেকে ঐসব প্রাণীরা খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা প্রায় বন্ধ করে দেয় এবং এক জায়গায় চুপটি করে বসে থাকে। কারণ বিজ্ঞানীর জনাচ্ছেন যে ভূমিকম্পের আগে বাতাসে পজিটিভ আয়নের বৃদ্ধি ঘটার কারণে প্রাণী রক্তে সিরোটোনিলের মাত্রা বেড়ে যায় এবং অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়।

লেখক ঃ শ্রী জয়দেব মাইতি, শিক্ষক - কেউটগেড়িয়া, বিদ্যাসাগর হাইস্কুল, রসায়ন বিভাগ, মোঃ- ৯৪৩৪৬৯২৩৬৫

কোবিদার/কাচনার

BAUHINIA TOMENTOSA LINN

Family : Caloalpiniaceae

নামান্তরে ঃ বাংলা - কাঞ্চন, হিন্দী-কাচনার সংস্কৃত কোবিদার

নামকরণ ও বিস্তার ঃ বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী John এবং Casper Bauhin নামক দুই জনের নামকে স্মরণীয় করার জন্য এর গণ নাম Bauhinia কারণ এই গাছের পাতাকে দেখলেই মনে হয় দুইটি যমজ পাতা একত্রে জুড়ে গিয়ে একটি পাতা হয়েছে।

আর প্রজাতি নাম Tomentosa কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Tomentum অর্থাৎ Tomentose থেকে যার অর্থ Chamber's Technical Dichonaryতে বলা হয়েছে, Coveredwith a felt of cottony hairs অর্থাৎ পশমী রোমযুক্ত আবরণে ঢাকা।

বৃক্ষটিকে হিমালয়ের পাদ দেশে সিন্ধুপ্রদেশ থেকে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য সমুহে বন্য অবস্থায় পাওয়া যায় এর মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। সমতল ভূমি থেকে ১৬০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত এর বিস্তার।

উত্তরবঙ্গে যে সমস্ত পার্কগুলিতে গাছটিকে দেখা যেতে পারে - বানারহাট, বালুরঘাট, বীরপাড়া, ধুপগুড়ি ক্রান্তি, ওদলাবাড়ী, শিলিগুড়ি (ডাব গ্রাম) পার্কে রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে কোচবিহারের নরেন্দ্রনারায়ন পার্কে।

পরিচিতি ঃ মাঝারি মাপের খাড়া মসৃণ প্রশাখাযুক্ত প্রায় চিরহরিৎ বৃক্ষ। ১০ থেকে ১৪ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। বাকল প্রায় মসৃণ এবং ছাই রঙা থেকে ঘন বাদামী রঙের।

পাতা ঃ প্রায় মসৃণ চামড়ার মত বলা যায়। লম্বার চেয়ে চওড়ায় বড়। অগ্রভাগ এক তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধাংশ কাটা এবং অগ্রভাগদ্বয় অর্ধসুক্ষ্ম।

ফুল ঃ বড়, গন্ধবহ ৬-৮ সেন্টিমিটার। পাতার কক্ষে ছোট বোঁটার করিম্বে কয়েকটি ফুল সাজানো থাকে শাখার আগার দিকে। ফুলগুলির রঙ বিভিন্ন মাত্রার লাল, নীলচে লাল, ফিকে লাল বেগুনী এমন কি সাদাও। বৃন্তিকা ৬-১২ মিলিমিটার, বৃতি নল ৫-১০ মিলিমিটার।

যুক্ত বৃতাংশ ঃ ১৮ থেকে ২৫ মিলি লম্বা চামড়ার মত ২ ভাগে বিভক্ত যাতে ৫টি অংশ দেখা যায় অর্থাৎ ৫টি বৃতাংশ একত্রে জুড়ে গেছে।

পাপড়ি ঃ লম্বা, সরু , বিভল্লাকার ৫টি; ৪-৬ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১.৫ সেমি চওড়া, দুই মাথা ক্রমশঃ সরু হয়ে আসা। উর্বর পুংকেশর ৩-৪টি থাকে। গর্ভ কোষ ধূসর রঙের পাউডার যুক্ত, লম্বা গর্ভদন্ড এবং মাঝারী লম্বা বাঁকানো গর্ভমুন্ড।

ফল ঃ ৩-১০ সেমি লম্বা এবং ২ সেমি চওড়া রোমহীন চ্যাপটা শিম। কিছুটা কাষ্ঠল এবং দেখতে অনেকটা ফ্রেঞ্চবীজের মত। ফলের মধ্যে ১২ থেকে ১৬টি চ্যাপটা ও উপবৃত্তাকার বাঁকানো বীজ থাকে। শিম বিলম্বে বিদীর্ণ হয়ে বীজ ছড়িয়ে যায়।

আবর্তন ঃ অক্টোবর মাসে শীতের শুরুতে গাছে ফুল আসে এবং জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে শিমগুলি পেকে যায়। মার্চ এপ্রিল মাসে অল্প কয়েক দিনের জন্য গাছটি পাতাহীন হয়ে যায়।

এরপর 4 পাতায়

ব্ল্যাক বাজা

1 পাতার পর

শেষ। নরম প্রভাতী আলো যখন সবে নতুন দিনের সূচনায় ব্যস্ত তখনই তিনটি পাখির একটি দলকে দেখি 'চি-উপ', 'চি-উপ' তীব্র হুইসলে আরণ্যক স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে উড়ে যেতে। ওড়ার মাঝে মাঝে সাময়িক বিরতি নিতেও দেখা গেল এই দলটিকে।

সেই বছরই দ্বিতীয়বার আবার এই ব্ল্যাক বাজাদের সন্ধান পাই দার্জিলিং পাহাড়ের বুনকুলুং-এ। দার্জিলিংয়ের অতি পরিচিত পর্যটন কেন্দ্র মিরিক এর অনতি দূরেই অবস্থিত এই বুনকুলং পাখি ও প্রজাপতির এক অনন্য সম্ভারে পূর্ণ নেহাতই ছোট্ট এক পাহাড়ী জনপদ। অক্টোবরের শুরুতেই সপ্তাহান্তের দুটি দিন কাটানোর সুযোগ হয়েছিল এই বুনকুলং গ্রামে।

বছরের এই সময় থেকেই শীতের ছোঁয়াচ লাগতে শুরু করে বুনকুলং এর

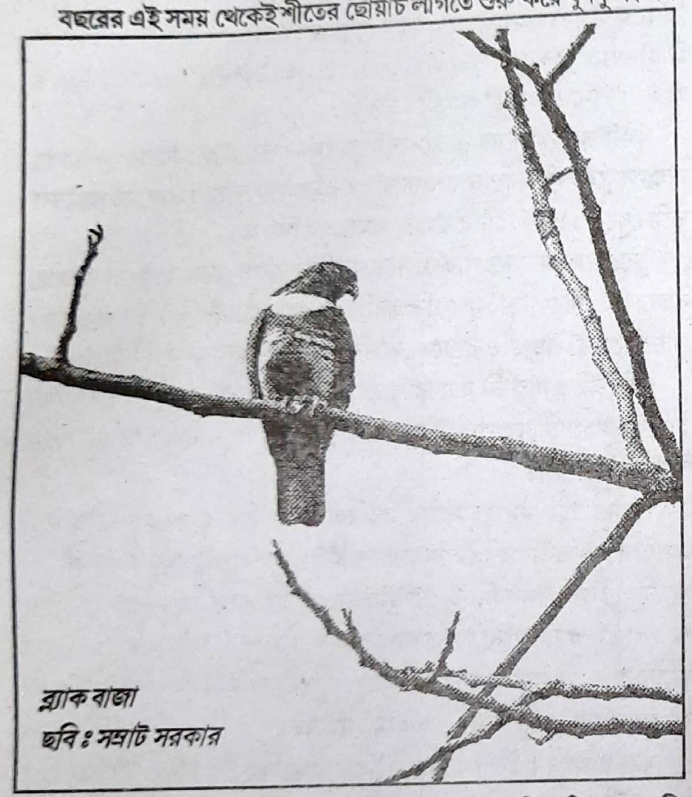

ব্ল্যাক বাজা
ছবি ঃ সম্রাট সরকার

বাতাসে। তাই ভোরের হিমেল বাতাস গায়ে মেখেই বেরিয়েছিলাম পাখি পরিক্রমায়, হিমালয়ের পাদদেশের পাখিদের সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আশায়। আমাদের 'Birding trail' এর শুরুটা ছিল গ্রামের প্রান্তে একটি ধান জমির গা ঘেষে। এখান থেকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কিছুটা নামলেই দেখা হয়ে যায় বালাসন নদীর সঙ্গে। ঠিক এইখানেই একটি প্রায় ন্যাড়া গাছের একদম উপরের দিকের ডালগুলিতে নজর পড়তেই গোটা ছয়েক সাদা কালো পাখির অবয়ব ভেসে ওঠে। দূরবীন চোখ রাখতেই নিশ্চিত হই যে এরা ব্ল্যাক বাজার দলই। গাছের মগডালে বসে যেন অরণ্যচারীদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ম নজর রাখছে।

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ছিল দলটিতে। উভয় ক্ষেত্রেই মাথায় দীর্ঘ কালো ঝুঁটির উপস্থিতি এদের একটি বিশেষ সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য। পাখিগুলির মাথা, গলা ও দেহের উপরিভাগ ঘন কালো রঙের। ডানায় খয়েরী ও সাদা ছোপ উপর খয়েরী পটি এবং পেটের নীচের অংশ কালো। চোখ লালচে বাদামী পা ও পায়ের পাতার রঙ ধূসর কালো, গাত্রবর্ণে স্ত্রী পাখিকে পুরুষ পাখির থেকে আলাদা করে। প্রথমতঃ স্ত্রী পাখির ডানায় সাদা ছোপ অবর্তমান এবং দ্বিতীয়তঃ এদের বুকে খয়েরী পটির সংখ্যা পুরুষ পাখির তুলনায় বেশী।

ভারতীয় উপমহাদেশে এই ব্ল্যাক বাজাদের তিনটি 'race' এর সন্ধান মেলে A. l. leuphotes, A. l. syama এবং A. l. andamanica। দাক্ষিনাত্যে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, উত্তরে নেপাল থেকে উত্তর-পূর্বে পহাড়ী রাজ্য, মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণে, বাংলাদেশে ও আন্দামানে বসতি রয়েছে এই ব্ল্যাক বাজাদের। A.l. syama নামক পূর্বের 'race' টি শীতে পূর্বঘাট পর্বতমালা ধরে শ্রীলঙ্কায় পরিয়ান (migrate) করে বলে ধরা হয়।

Migration কালে এরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সাধারণতঃ সফর করে। নদী বা কোন জলধারার সন্নিকটে এদের দেখা যায় কোনো উঁচু গাছের ডালে বসে থাকতে। সূর্যোদয়ের ঠিক পরে ও সূর্যাস্তের ঠিক আগেই এদের বেশী সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায়।

এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে পতঙ্গ, গেছো ব্যাঙ, টিকটিকি আবার কখনো বা ছোটো পাখি।

এদের বাসা বাঁধা ও প্রজননের সময়কাল উত্তর পূর্বের 'race' টির ক্ষেত্রে যেমন এপ্রিল থেকে জুন, দক্ষিণাত্যের 'race' টির ক্ষেত্রে কিন্তু এই সময়কাল বেশ প্রলম্বিত ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই অবধি।

বাসা বাঁধার উপকরণ হিসেবে এরা ব্যবহার করে ঘাস, পাতা, তন্তু, কাঠি ইত্যাদি। স্ত্রী পাখি এক সঙ্গে ২-৩টি ধূসর সাদা বর্ণের ডিম পারে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে বাবা-মা উভয়েই সন্তান পালনে অংশগ্রহণ করে। ছোট্ট নবজাতককে মূলতঃ পতঙ্গ ধরে খাওয়ায় বাবা-মা।

আমাদের দেখা ব্ল্যাক বাজার দলটি পূর্বোক্ত ন্যাড়া গাছে প্রায় ২০-২৫ মিনিট ধরে বসেছিল। ধরে নেওয়া যেতেও পারে এই গাছেই রাত্রিযাপন করেছিল তারা। কারণ পরদিন ভোরেও ঠিক একই গাছে তাদের বসে থাকতে দেখেছিলাম। এই পুরো সময়টা জুড়ে প্রায় প্রত্যেকটি পাখিকেই দেখেছিলাম বেশ মনোযোগী হয়ে পালক পরিষ্কার করতে। প্রত্যেকটি পালক থেকে ধুলো ময়লা, পরজীবী দূর করে পালক পরিষ্কার রাখতে, পালকগুলির সঠিক পারস্পরিক অবস্থান বজায় রাখতে এবং নমনীয়তা বজায় রাখতে এটি প্রত্যেক পাখির ক্ষেত্রেই একটি অতি আবশ্যিক প্রাত্যহিক কর্ম। দলের একটি পাখি কিন্তু বেশ নিস্ক্রিয়ভাবে বসেছিল। হঠাৎ এক সময় দেখলাম সেটি গলা প্রসারিত করে কিছুটা অস্থির হয়ে উঠেছে। এরপর মাথাটি খুব দ্রুত ঝাঁকুনি দিয়ে গলা প্রসারিত করে কিছু উগরিয়ে দিল পাখিটি। পাখিদের ক্ষেত্রে এটি একটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা যাকে 'Regurgitation' বলা হয়।

এর কিছু সময় পরেই ব্ল্যাক বাজার পুরো দলটিই উড়ে যায়। দিনের শেষে এই গাছটি থেকে অনতি দূরেই অপর একটি গাছে আবার চারটি ব্ল্যাক বাজার দেখা পাই। নিশ্চিত হওয়া যায় না যে এ দলটিই সকালের দলটি কিনা, কারণ সদস্য সংখ্যা দুটি কম। পরদিন সকালে ঐ ন্যাড়া গাছে ঐ ছয় সদস্যের দলটিকে পুনরাবিষ্কার করে যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিলাম।

বুনকলুং-এ থাকার সময়কাল এত স্বল্প হওয়ায় এই দলটির গতিবিধি সম্বন্ধে বিশদে জানবার আর সুযোগ হয়নি। সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারা যায়নি যে দলটি এই বনপাহাড়ের দেশের স্থায়ী বাসিন্দা না 'Migration' কালে এটি তাদের সাময়িক আস্তানা মাত্র।

লেখক ঃ স্বাগতা সরকার, মোঃ- ৮৯০০৪১০৫৪৫

সোনার সন্ধানে

1 পাতার পর

সোনার এত গুরুত্বের মূলতঃ দুইটি কারণ। প্রথমতঃ এই ধাতুর অপরিবর্তনীয়তা আর দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার মূল্য মান স্থির রাখার উপায় হিসাবে সোনার প্রয়োজনীয়তা। সোনা সাধারণতঃ কোয়ার্ৎজ (Quartz) নামক এক খনিজ পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। সোনা মিশ্রিত এই কোয়ার্ৎজ যখন প্রাকৃতিক কারণে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে জলস্রোতের সঙ্গে প্রবাহিত হয়, তখন সোনার অতি ক্ষুদ্র কণাগুলি বালি ও নুড়ির সঙ্গে নদী পথে জলপ্লাবিত হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। এইরকম স্রোতবাহিত সোনার পরিমাণ খুব যৎসামান্য। উড়িষ্যা, বিহার, আসাম, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে নদীতে সোনা পাওয়া যায়। সুবর্ণরেখা নদীর বালি থেকে এখনও কখনো কখনো সোনা পাওয়া সম্ভব হয়, যদিও তার পরিমান খুবই সামান্য।

এখন সোনা দুর্মূল্য ও সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু মাত্র ৩০ বছর আগেও যে সোনার মাত্র ১০ গ্রামের মূল্য ছিল আনুমানিক ১৬০০ টাকা, সেই সোনার মূল্য আজ প্রায় ৩০ হাজার টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম)। কল্পনাই করা যায় না এই মূল্যের কথা, এই মূল্যবান ধাতুটির অস্বাভাবিক চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে, সোনা সন্ধানের বিকল্প পন্থার বহুদিন যাবৎ বিজ্ঞানীরা চিন্তা ভাবনা করে এসেছেন। যেহেতু সোনা একটি খনিজ পদার্থ, সেজন্য সেটি একমাত্র সোনার খনি থেকেই নিয়ন্ত্রিত ভাবে তোলা হয়।

ধাতু হিসাবে সোনা যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনই তার কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে, যা অন্য ধাতুর নেই। সাধারণ অ্যাসিডে সোনার কোনো ক্ষতি হয় না, সেজন্য সোনাকে Noble Metal বলা হয়। অবশ্য একমাত্র কোরিন ও অ্যাকোয়া রিজিয়া তে (নাইট্রিক অ্যাসিড ও হাইড্রোকোরিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণ) এই ধাতু দ্রবনীয়। সোনা খুবই নমনীয় এবং ঘাত সহ। সোনার পাতকে পিটিয়ে এক ইঞ্চির ২৫,০০০ ভাগের (২৫ মিল) এক ভাগ পাতলা পাতে রূপান্তরিত করা যায়।

সারা পৃথিবীতে সোনার চাহিদা প্রবল কিন্তু চাহিদার তুলনায় পৃথিবীতে সোনার অস্তিত্ব খুবই কম। আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত মাত্র সত্তর/আশি হাজার টনের মত সোনা মানুষ পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে নিষ্কাষণ করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের দেশে মহীশূরের কোলার স্বর্ণখনি থেকে সোনা পাওয়া যায়। তবে, পৃথিবীতে উৎপন্ন মোট সোনার প্রায় ৭০ শতাংশ আসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত স্বর্ণ খনি 'র‍্যান্ড' থেকে এবং শতকরা ২৫ ভাগ পাওয়া যায় অধুনালুপ্ত রাশিয়া থেকে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, পৃথিবীর ত্বকের উপাদানের ভিতর সোনা আছে মাত্র ৫×১০^{-৭} ভাগ। অবশ্য সমুদ্র জলে কিছু সোনা পাওয়া যায়। সোনার বিকল্প উৎস হিসাবে পৃথিবীর সমুদ্র ও মহাসাগরের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। কিন্তু সমুদ্রে কী পরিমান সোনা আছে? প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, সারা পৃথিবীর সব কয়টি সমুদ্র ও মহাসাগর ধরলে, তার মধ্যে থাকা মোট সোনার পরিমান হবে আনুমানিক ৪০ লক্ষ টন, যা দ্রাবন হিসাবে আছে। কিন্তু এই বিশাল পরিমাণ সোনা সমুদ্র থেকে কিভাবে উদ্ধার করা সম্ভব? ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দ্রবীভূত অবস্থায় সমুদ্রের মধ্যেকার এই সোনাকে বার করে আনা এক কষ্টকর, ব্যয় সাপেক্ষ এবং দুঃসাধ্য ব্যাপার।

হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে প্রতি টন সমুদ্র জলে মাত্র ০.১-২.০ মিলিগ্রাম মত সোনা থাকে। অবশ্য সমুদ্রের একেবারে তলদেশে বা জলজ উদ্ভিদের মধ্যে এই উপস্থিতির হার কিছুটা বেশি। মনে করা হয় যে, সমুদ্রের জলকে যথাযথ ভাবে বাষ্পীভূত করে, তার মধ্যেকার সোনাকে বার করা যেতে পারে। প্রকৃত পক্ষে, এক গ্যালন সমুদ্র জলকে বাষ্পায়িত করলে, যে পরিমান কঠিন পদার্থ পড়ে থাকে, তার পরিমান মাত্র ৫ আউন্স, যার মধ্যে সোনা থাকতে পারে অতি সামান্য পরিমাণে। বেশি অংশটাই হল লবন। সুতরাং পর্যাপ্ত পরিমাণ সোনা পেতে হলে বিপুল পরিমান সমুদ্র জলকে বাষ্পায়িত করতে হবে। যদি ধরাও যায় যে এমন এক যন্ত্র পাওয়া গেল, যার সাহায্যে বিশাল পরিমাণ সমুদ্র জলকে বাষ্পায়িত করা সম্ভব, তাহলেও সেক্ষেত্রে এক ঘন মাইল (৪.২ ঘন কিলোমিটার) পরিমান সমুদ্র জলকে বাষ্পায়িত করতে পারলে, সোনা পাওয়া যাবে প্রায় ৫০ পাউন্ড বা ২২ কিলোগ্রাম মত। অন্য এক হিসবে ৫০ লক্ষটন পরিমান সমুদ্র জল বাষ্পায়িত হলে, সোনা পাওয়া যাবে ১৭ আউন্সের মত।

এই বিশাল পরিমান সমুদ্র জলকে বাষ্পায়িত করতে যে পরিমান অর্থ ব্যয় হবে, তার পরিমান প্রাপ্ত সোনার মূল্য থেকে অনেক বেশি। এই বিপুল ব্যয়, এই পদ্ধতির অন্যতম অন্তরায়, পদ্ধতিটিও বেশ জটিল। তবুও মানুষের প্রচেষ্টার শেষ নেই এবং সমুদ্র জল থেকে সোনা আহরণের পেটেন্ট বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশে গ্রহণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বিশাল পরিমান লবন ম্যাগনেসিয়াম ধাতু সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়েছে। আর তাহলে সোনা নয় কেন?

প্রশ্ন স্বভাবতহ উঠতে পারে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীদের এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হবে আর তখন বিভিন্ন গবেষণাগার থেকেই অফুরন্ত সোনা পাওয়া সম্ভব হবে। সেই অনাগত শুভ দিনের প্রতীক্ষায় আমরা তাকিয়ে থাকি।

লেখক ঃ অধ্যাপক (ডঃ) সমীর কুমার ঘোষ
'পরমাণু', পূর্বপল্লী, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৫,
মোঃ- ০৯৪৩৪১৫৭৭৫৩ / ০৯২৩৩১৮৯১৭০

নুডল খাবেন না

1 পাতার পর

MSG মস্তিষ্কে ক্ষতি করে। এটি বৃক্কের নানা রোগ নিয়ে আসে। শরীরের কিছু অসংগতিও আজিনা মটর নিয়ে আসে। কারুর কাছে এই অ্যালার্জির উপাদান, ত্রুটি বুকে ব্যাথা, মাথা ধরাকেও সাথী করে।

মোম ঃ নুডলগুলোর পরস্পর জড়িয়ে যাওয়া রুখতে তাদের মোমের আস্তরণ দেওয়া হয়। গরম জলে নুডলগুলো ডোবালে, জলের উপরিতলে সাবান ভেসে থাকতে দেখা যায়। এই মোম খাদ্যনালির উপর সমস্যা তৈরী করে — কোষ্ঠকাঠিন্য ও পেটের সমস্যা ঘটায়।

ক্যান্সারের কারণ ঃ এই তাৎক্ষনিক নুডলে এমন জিনিস থাকে যা ক্যান্সার রোগের কারণ হয়। বিশেষ করে নুডলগুলি যখন কাপ বা বাটিতে মোড়ক করা হয়। নির্দিষ্ট সময় পর কাপে অবস্থিত রাসায়নিক নুডলের সঙ্গে মিশে যায়।

যকৃতের ক্ষয় ঃ হিউমিকটেন্ট বা জমাট বিরোধী বস্তু নুডলে থাকে এটি নুডলকে অনেকদিন ধরে তাজা রাখে। এই ধরণের বস্তুগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। এরা যকৃত ও বৃক্কের ক্ষতি করে। এই রকম একটি বস্তু হল প্রপাইলিন গ্লাইকল। এটি মানুষের অনাক্রমতার ক্ষমতাকেও কমিয়ে দেয়।

ওজন বৃদ্ধি ঃ ময়দা জাতীয় কার্বহাইড্রেট থেকে নুডল তৈরী হয়। এছাড়া MSG, লবন, গন্ধ দ্রব্য ইত্যাদি এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এই কার্বোহাইড্রেট রক্তের শর্করাকে হঠাৎ বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে অতিরিক্ত ইনসুলিন নির্গত হয়। ফলে শরীরে চর্বি জমা হয়।

গ্যাস, পেট ফাঁপা এবং বদহজম ঃ যদিও তাৎক্ষনিক নুডল তাড়াতাড়ি রান্না করা যায় কিন্তু হজম হতে সমস্যা দেখা দেয়। নিট ফল - গ্যাসের আগমন ও পেট ফুলে ওঠা।

সুতরাং যে তাৎক্ষনিক নুডল রোগকে ডেকে আনছে, তাঁকে স্বাদ করে 'চটজলদি সুস্বাদু' বলে আমাদের শরীরে আহ্বান করবো কেন? একটু ভেবে দেখবো কি?

লেখক ঃ তাপস মজুমদার, মোঃ- ৯৮৭৪৭৭৮২১৬

চন্দ্রবোড়া (Russell's Viper)

Family : Viperidae বিজ্ঞান সম্মত নাম ঃ Daboria russelli

বাংলা ঃ চন্দ্রবোড়া, উলুবোড়া।

ইংরেজী ঃ ইন্ডিয়ান রাসেল ভাইপার, চেইন ভাইপার।

বিচরণ ঃ দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জ বাদ দিয়ে ভারতে সর্বত্র পাওয়া যায়। আসাম, বিহার, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, দমন দিউ, গোয়া, হরিয়ানা, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, কেরালা, ঝাড়খন্ড, মহারাষ্ট্র, ওড়িষা, পন্ডিচেরী, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গে এদের সুবিস্তার বর্তমান। ভারতবর্ষ ছাড়া বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, পাকিস্তান, স্কটল্যান্ড, চীন, শ্রীলঙ্কায় চন্দ্রবোড়া পাওয়া যায়।

চিনব কেমন করে ? হৃষ্ট পুষ্ট চেহারা দেখে সহজেই এদের চিনতে পারা যায়। সারা দেহে তিনটি সারিতে চোখের মত চিহ্ন মাথার পিছন থেকে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত। কাছ থেকে দেখতে অনেকটা শিকল বা চেইন এর মত লাগে। সাধারণত মাটির রঙের সাথে এদের রঙ মিশে যায় - তাই এরা খুব সহজে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে সক্ষম। হাল্কা নস্যি রঙেরও হয়। সারা দেহ শুকনো আঁশে ঢাকা, দেহ খসখসে প্রকৃতির তিনকোনা মাথা, গলা সরু হয়, দেহ অপেক্ষাকৃত মোটা, লেজ ছোট হয়। ভোঁতা নাক, গোলাকার এবং সামান্য উঁচু। নাসারন্ধ্র সাধারণত বড়। মাথার আঁশ দেহের আঁশের তুলনায় ছোট।

দৈর্ঘ্য ঃ গড় দৈর্ঘ্য 100 cm বা 3.3ft। সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যর চন্দ্রবোড়ার দৈর্ঘ্য 180cm বা প্রায় 6ft।

কোথায় থাকতে পছন্দ করে ঃ সমতল ভূমিতেই বেশী দেখা মেলে। ফাঁকা মাঠ, চাষের জমি, শুকনো পাতার স্তূপে, ঝোঁপ ঝাড়ে, আর্দ্র জায়গায় দেখা মেলে। সমতল থেকে 3000m উচ্চতায়ও এদের দেখা পাওয়া গেছে। প্রধানত যে সমস্ত জায়গা ইঁদুর ও ইঁদুর জাতীয় জীবের প্রাচুর্য বেশী সেখানেই এদের বেশী মাত্রায় দেখা মেলে। কেওড়া গাছের জঙ্গল এদের প্রিয় বাসস্থানের অন্তর্গত। নিজেরা বাসা বানাতে অক্ষম, ইঁদুরের গর্ত, উঁইঢিবি, বাড়ির ফাটল, জমা করে রাখা পাতার স্তূপে এরা বাস করে।

চাল চলন ঃ প্রধানত রাতেই এরা শিকার করে - দিনের বেলা সে রকম ভাবে চোখে পড়ে না। এরা খুবই অলস। দিনের বেলা এদের রোগে গা সেঁকতে দেখা যায়, নির্জীবের মত কুন্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে। তবে এরা ভয় পেলে শরীর ফোলাতে শুরু করে এবং প্রেসার কুকারের সিটির মত আওয়াজ বের করে। দেখে যতটা নির্জীব বা অলস মনে হয়, আদতে এরা তা নয় - চোখের পলকে (১ সেকেন্ডের ৬ ভাগের এক ভাগে) এরা ছোবল মারে, ছোবল মারার পূর্বে এরা মাথা কিছুটা পিছিয়ে নিয়ে আসে এবং আক্রমণ করে।

বংশগতি ঃ শীতের শেষের দিকে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি পর্যন্ত এদের প্রজনন ঋতু। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ পরিলক্ষিত হয় পুরুষ সাপেদের মধ্যে। স্ত্রী চন্দ্রবোড়া গ্রীষ্মের শেষ থেকে বর্ষার মধ্যে ৬-৯৬টা বাচ্চার জন্ম দেয়। এদের এজন্য ovoviviparous বলা হয়। এদের ডিম মাতৃ জরায়ুতে থাকাকালীনই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। বেশী মাত্রায় বংশোৎপাদন করার ফলে পুষ্টির অভাবে এবং সঠিক শারীরিক গঠনের অভাবে অনেক বাচ্চা জন্ম মুহূর্তে এবং কিছু বাচ্চা জন্মানোর কয়েক দিন পরেই মারা যায়।

বিষ বা Venom ঃ চন্দ্রবোড়ার বিষ হিমোটক্সিক, যা সরাসরি রক্তের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে। অন্যান্য সাপ তাদের দেহে মজুত বিষের ১০ শতাংশ ব্যবহার করে প্রতিটি ছোবলে, কিন্তু চন্দ্রবোড়া তার দেহে উপস্থিত বিষের ৭৫ শতাংশ ঢেলে দেয় আক্রমনকারীর উপর। যার জন্য এর প্রকোপ ও প্রভাব মারাত্মক। ২৪ ঘন্টার মধ্যে কিডনি বিকল হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। এদের বিষের ফলস্বরূপ রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করে, রক্তে স্কন্দক পদার্থ কমে যায় এবং মাংস পেশীরও ক্ষতি হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির দ্রুত চিকিৎসার দরকার। সাধারণ এরা কামড়ালে ক্ষত স্থান থেকে চুইয়ে রক্ত বেরোতে দেখা যায়।

বিষ দাঁত ঃ চন্দ্রবোড়ার বিষ দাঁত Solenoglyph প্রকৃতির এবং ভারতীয় ভাইপার বা বোড়া সাপেদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। Solenoglyph ধরণের দাঁত মুখ বন্ধ থাকলে ভাঁজ হয়ে থাকে। এদের কয়েক জোড়া অতিরিক্ত বিষ দাঁতও থাকে।

বিষের পরিমান ঃ একটি চন্দ্রবোড়ার বিষ থলিতে প্রায় 145mg বিষ মজুত থাকে। যার মাত্র 42mg মানুষের জন্য 'fatal dose' বা প্রাণহানিকারক।

চন্দ্রবোড়ার বিষের প্রভাব ঃ ১) আক্রান্ত স্থানে ক্রমাগত ব্যাথা বেদনা ও জ্বালা। ২) কামড়ানোর ঘন্টা দুয়েক বাদে কামড়ানোর জায়গা ভীষণ ভাবে ফুলে ওঠে। ৩) ফোস্কা পড়া। ৪) গা গোলানো এবং বমি বমি ভাব। ৫) প্রচুর রক্তক্ষরণ, দাঁতেরমাড়ি থেকে রক্তক্ষরণ। এক্ষেত্রে কেউটে/ গোখরো কামড়ালে যেমন মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা ওঠে, তা দেখা যায় না। এর বিষ মানব শরীরের vasomotor centreকে দমিয়ে রাখে এবং রক্তকে নষ্ট করে দেয়। Blood pressure কমে যায় এবং হার্ট দুর্বল হয়ে পরে। লোহিত রক্ত কনিকা নষ্ট হয়ে যায় এবং তখন ক্ষমতা লোপ পায়। কার্ডিয়াক rspiratory failure অথবা rspiratory failure এ আবার কখনো septicaemia হয়ে মানুষ সাপে কাটার ১ থেকে ১৪ দিনের মাথায়ও মারা যেতে পারে।

বিষরোধী সিরাম ঃ ভারতবর্ষে একমাত্র হফকিন ইন্সটিটিউটে প্রস্তুত poly-valent serum এই বিষের প্রতিরোধী সিরাম।

সংরক্ষণ ঃ ভারতীয় বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনের schedule II অনুযায়ী এই সাপ সংরক্ষিত। এই সাপ ধরা বা মারা আইনত দন্ডনীয়। (schedule II, 1972)

এই সাপের মত দেখতে অন্য সাপ ঃ ভারতীয় অজগর (Indian Rockpython)।

বিশেষ তথ্য ঃ এই সাপ 'Indian Big four' এর সদস্য, এর কামড়ে ভারতবর্ষে সর্বাধিক লোক মারা যায়। অবশ্য স্থান দখলে চন্দ্রবোড়ার সঙ্গে ফুর্সার (saw scaled viper) তুলনামূলক লড়াই চলে। কোন বছর ফুর্সা প্রথম স্থান এবং চন্দ্রবোড়া দ্বিতীয়, আবার কোন বছর চন্দ্রবোড়া প্রথম স্থান ফুর্সা দ্বিতীয়।

লেখক ঃ নীলেন্দু কেশ, মোঃ- ৭২৭৮২২৯৪৮৪

পিঁপড়ের ভাব বিনিময়

আমাদের চারপাশে যে সমস্ত কীটপতঙ্গ সাধারণত দেখতে পাই তার অন্যতম হল পিঁপড়ে। পিঁপড়েরা সামাজিক কীট। তাদেরও নিয়ম কানুন আছে। তারাও নিজেদের মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদান করে। কেউ একজন খাদ্যের সন্ধান পেলে অবিলম্বে সে সংবাদ বন্ধুবান্ধবদের জানায় এবং তাদের শিকারের কাছে নিয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে পিঁপড়েরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে কিভাবে? তারা এই কাজটা করে গন্ধের সাহায্যে। পিঁপড়েদের তলপেটে আছে গন্ধ যুক্ত পদার্থ নিঃসরণকারী বিশেষ গ্রন্থি। পিঁপড়ের ঢিবি লক্ষ্য করলে দেখা যায় কোন কোন পিঁপড়ে হয়ত নিশ্চিন্ত মনে ছুটে চলেছে। তার মানে তারা ছুটছে অমনি অমনি। আবার কারুর চলাফেরা অদ্ভুত - কিছুক্ষণ পর পরই একটু করে বসছে। মাটিতে তলপেট ঠেকাচ্ছে। এইভাবে সে গন্ধ যুক্ত তরল পদার্থের সাহায্যে পথ চিহ্নিত করে রাখছে। এর মানে সে কিছু একটার সন্ধান পেয়েছে এবং শিগগিরিই দলবল নিয়ে সেখানে ফিরে যাবে - মনে হয় একার পক্ষে শিকার বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শিকারের পথ যাতে খুঁজে পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে পিঁপড়ে গন্ধ যুক্ত চিহ্ন রেখে যাচ্ছে।

একবার আমি পিঁপড়ের ঢিবির সামান্য দূরে একটা শুঁয়োপোকা রেখে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে শিকার সন্ধানী পিঁপড়ে এসে হাজির। শুড় দিয়ে শিকারকে নেড়ে চেড়ে দেখার পর সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার বাসার দিকে ছুটল। শিগগিরি সে ফিরে এলো। এবার সদলবলে। অর্থাৎ পিঁপড়ে যতই তাড়াহুড়ো করুক না কেন গন্ধ দিয়ে সে তার পথ চিহ্নিত করতে ভোলে নি। গন্ধ তাকে পথ দেখিয়ে ফেলে যাওয়া শুঁয়োপোকার কাছে নিয়ে এলো।

সে কিন্তু শুধু নিজের জন্য গন্ধের নিশানা ছেড়ে যায়নি। সন্ধানী পিঁপড়ের ছেড়ে আসা গন্ধ অন্যরাও অনুসরণ করে। কিভাবে সেটা বুঝলাম? সন্ধানী পিঁপড়ে অন্যদের আগে ছুটছিল। তাকে যেতে দিয়ে আমি চটপট মাটির ওপর ছুড়ি দিয়ে একটা খাত তৈরী করে দিলাম। পিঁপড়েরা এই বাধা সহজেই অতিক্রম করে। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে খাতের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অস্থির হয়ে খাতের কিনারায় শুড় বুলিয়ে দেখতে লাগল, একদল খাতের মধ্যে নেমে গেল। বাদ বাকিরা কি যেন খুঁজতে খুঁজতে খাত বরাবর ইতস্তত ঘুরতে লাগল।

শিকার সন্ধানী পিঁপড়েটি ইতিমধ্যে শুয়োপোকার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, একমাত্র তখনই সে লক্ষ্য করল যে তার পিছনে কেউ নেই। এবার সে ফিরে উল্টো পথ ধরল, খাত পেরিয়ে ওপারে গিয়ে নিজের সঙ্গী সাথীদের দেখা গেল - আবার তারা এক জায়গায় মিলে জোট পাকিয়ে আছে।

আবার পথ প্রদর্শক সন্ধানী পিঁপড়ে ছুটতে শুরু করল শিকারের দিকে। বাকি পিঁপড়েরা তাকে অনুসরণ করল নির্দিদ্ধায় কারণ সন্ধানী পিঁপড়ের ছড়িয়ে দেওয়া গন্ধ তারা পেয়েছে।

ওদের পথে খাত বানিয়ে দেওয়ার পর গন্ধের চিহ্ন তারা হারিয়ে ফেলে। যদিও তারা সঙ্গীটিকে দেখতে পেয়েছিল কোন দিকে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও গন্ধ না পাওয়ায় তারা তাকে অনুসরণ করেনি। শুঁয়েপোকাটার কাছে ছুটে গিয়ে পিঁপড়েরা তাকে ধরে নিজেদের ঢিবির দিকে নিয়ে যেতে যতগুলো পিঁপড়ে দরকার ততগুলোই কেন এল? শিকার যদি আরও ভারী কিংবা হালকা হত? তা হলে কি পিঁপড়ের সংখ্যার হেরফের হত? এটাত যাচাই করে দেখা যেতে পারে।

আমি পিঁপড়ের ঢিবির সামনে ছোট্ট একটা মাকড়সা রাখলাম। এবার আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। শুধু পরিবর্তন হল পিঁপড়ের সংখ্যার। এভাবে কখনও বড়, কখনও ছোট নানা রকম পোকামাকড় দিয়ে দেখলাম যে কজন সঙ্গী হলে শিকারকে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে সন্ধানী পিঁপড়ে সেই কয়জনকেই সঙ্গে করে আনে। অর্থাৎ গন্ধের ভাষায় পিঁপড়েরা বলতে পারে কোথায় শিকার, কত তার আয়তন, তাকে আনতে কতজন লাগবে ইত্যাদি বিষয়। গন্ধের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে শিকারের আয়তন - গন্ধ যত উগ্র হবে শিকারও তত বড় এবং তার বিপরীত বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন। তবে একথা সত্যি যে গন্ধ যতই তীব্র হোক না কেন তা দীর্ঘস্থায়ী নয়। গন্ধ যদি বেশিক্ষণ থাকত তা হলে শিকার নিয়ে যাওয়ার পরও পিঁপড়েরা যে জায়গায় তা পড়ে ছিল তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। সেরকম কিছু ঘটে না।

আবার এক শ্রেণীর পিঁপড়ে আছে, যারা সাধারণত মরুভূমি ও আধা মরুভূমিতে থাকে, গন্ধ যুক্ত পথ মাটিতে না বানিয়ে শূন্যে বানায়। কারণ এইসব জায়গায় দিনের বেলায় মাটি প্রচন্ড গরম থাকার দরুন তলপেট দিয়ে মাটি স্পর্শ করা যায় না। তাই তারা তলপেটের অগ্রভাব মাটিতে না চেপে বাঁকিয়ে ওপরের দিকে তুলে গন্ধ যুক্ত তরল পদার্থ ছিটায়। বাতাস না থাকলে গন্ধ বেশ কিছুক্ষণ এক জায়গায় থেকে যায়, দিক নির্দেশ করে।

শুধু পিঁপড়ে নয় পৃথিবীর সব প্রাণী কীট পতঙ্গেরই আছে নিজস্ব ভাব বিনিময় পদ্ধতি। *লেখক ঃ জয় বিশ্বাস, মোঃ-৯৪৩৩১০৪৮৫৮*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ ইডরি দ্সিত্রিয়েভ এর "হ্যালো স্কুইরেষগ্রন্থের" আংশিক অনুবাদ।

কোবিদার কাচনার

3 পাতার পর

বংশবৃদ্ধি ঃ মার্চ - এপ্রিল মাসে বীজ বপন করে খুব সহজে চারা তৈরী করা যায়। জলসেচ করে জায়গাটি ভিজিয়ে রাখলে ৪ থেকে ১০ দিনের মধ্যে অঙ্করোদগম হয়ে থাকে। চারাগাছ প্রতিস্থাপন করতে হলে তা বর্ষাকালেই করতে হয়। মাঝারী মাপের বাগানে গাছটিকে লাগানো যেতে পারে। পার্কে এবং মন্দিরের আশেপাশে গাছটিকে লাগানো হয়ে থাকে।

ঔষধিমূল্য ঃ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় গাছের বা মূলের ত্বক, ফুল, ফল (বীজ) ও পাতা। এটি প্রধান ভাবে কাজ করে রক্তধাতুতে আশ্রিত পিত্ত ও শ্লেস্মা বিকারজনিত রোগে।

ঔষধি ব্যবহার ঃ অর্শ রোগে ছালের চূর্ণ ৫০০ মিলি গ্রাম সদ্য পাতা দই দিয়ে এক বার করে খেতে হয় আর বিশেষ উপকার না পেলে সকালে ও বিকালে দুবার খেতে হবে। এর দ্বারা অর্শের জ্বালা যন্ত্রনার উপশম হবে।

দাহ রোগে ঃ রক্ত কাঞ্চনের ফুলের রস এক চা-চামচ মাত্রায় জল সহ সিকি কাপ কাঁচা দুধের সঙ্গে প্রতিদিন খেতে হয়। দুধ অভাবে শুধু জল সহ খেলেও চলবে।

রক্তপিত্তে ঃ রক্ত কাঞ্চন ফুলের রস ১ চামচ করে দুধের সঙ্গে প্রতিদিন খেতে হবে। কয়েকদিন ব্যবহার করতে ঐ রোগ প্রশমিত হবে।

লেখক ঃ প্রণবেশ কুমার চৌধুরী, আলিপুরদুয়ার, মোঃ-[illegible]

ফ্রী-র দোলায় দুলছি মোরা

দিন পাল্টেছে। এখন আর রাস্তা দিয়ে হকারের দল হেঁকে যায় না — 'যা নেবে তাই সারে ছ' আনা'। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ওরাও এখন আধুনিক হয়ে উঠেছে। ওদের এখন নতুন নাম হয়েছে 'বিজ্ঞাপন'। পসরা নিয়ে এখন ওরা হাজির হয় আমাদের ড্রইংরুমে অথবা বেড রুমে। সকালে ড্রইংরুমে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজ খুললে ওদের দেখা পাওয়া যাবে। বিকেলে ড্রইংরুমে অথবা বেডরুমে আয়েস করে বসে টিভি-র সুইচ অন করলে দেখা যাবে সেখানেও ওরা হাজির। ওদের হাত থেকে পালাবার পথ নেই। শুনতে না চাইলেও জোর করে ওরা ওদের কথা শোনাবে। ওদের এখন নতুন শ্লোগান — 'যা কিনুন সঙ্গে ফ্রী। এমন কোনো বিজ্ঞাপন নেই যেখানে ফ্রী-র উল্লেখ নেই। যাই হোক না কেন সঙ্গে ফ্রী কিছু পাওয়া যাবেই। বর্তমানে 'ফ্রী' দেবার এতই হিড়িক পড়েছে যে ক্রেতারা দিশেহারা হয়ে পড়ছেন। কোনটা ছেড়ে কোনটা কিনবে ঠিক করত পরছেন না। অবশেষে নেমে পড়ছেন 'ফ্রী' কুড়ানোর খেলায়। 'ফ্রী' কুড়োতে গিয়ে মধ্যবিত্তের বাজেটে পড়ছে টান। এতদিন যে টাকায় একটি মাজন কিনে মাস চালানো যেত এখন আর তা হচ্ছে না। কারণ 'ফ্রী' পাওয়ার লোভে মাজন শেষ হচ্ছে তাড়াতাড়ি। এছাড়াও অলক্ষ্যে মাজনের দামও যাচ্ছে বেড়ে। এরকম প্রতিটি পণ্যের জন্যই অতিরিক্ত অর্থ গুণতে হচ্ছে প্রতি মাসে।

প্রচার মাধ্যমগুলির মধ্যে টিভিই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। খবর, সিরিয়াল, খেলা, সিনেমা যাই হোক না কেন মিনিটে মিনিটে মাছির মতো ভন ভন করবে 'ফ্রী'-র বিজ্ঞাপন। কতক্ষণ আর কান বন্ধ করে থাকা যায়? এক সময় না এক সময় শুনতেই হবে। সোনাদানা পাওয়া যাবে বলেও মাঝে মধ্যে বিজ্ঞাপন বের হয়। এই তো বেশ কিছুদিন আগে শোনা যাচ্ছিল সাবানের মধ্যে নাকি সোনা লুকোনো আছে। কোনটায় আছে তা অবশ্য জানা নেই। ক্রেতাকেই খুঁজে নিতে হবে। উপায় একটাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গায়ে সাবান ঘষে তাকে গলিয়ে ফেল। প্রতিদিন সকাল-বিকেল দুবেলাই, সাবান ঘষে নাও। সাবান যত তাড়াতাড়ি গলবে সোনা পাওয়ার সুযোগ ততই বাড়বে। অতএব বাজেটের দিকে না তাকিয়ে সাবান ঘষা চালিয়ে যাও জোড় কদমে। এত করেও যদি সোনা না পাওয়া যায়, তাহলে হতাশ হবার কিছু নেই। ছোট বয়সে শেখা সেই কথাটা এখন কাজে লাগবে — 'একবারে না পারিলে দেখ শতবার'।

ফ্রী-র ময়দানে এখন অনেকেই নেমে পড়েছে। গুনে শেষ করা যাবে না। তবে এদের পিছনে দৌড় শুরু করার আগে একটু সাবধান হলে ভাল। কারণ বাজেট মাঝে মধ্যে অসহযোগিতা করতে পারে।

আমাদের দেশে ফ্রী-র ধ্যান-ধারণা নতুন কিছু নয়। কয়েক দশক আগেও সেলুনে চুল কাটার পর নখ কাটা ছিল ফ্রী। দোকানে কচুরীর সাথে একাধিকবার ডাল পাওয়া যেত। এরজন্য অতিরিক্ত কোনো মূল্য দিতে হত না। এখন তো মিষ্টির দোকানে রসগোল্লা কিনলে শুধু রসগোল্লাটাই তুলে দেয় সে সময় রস সহ রসগোল্লা বিক্রি হত। রসটা ছিল ফ্রী।

সে যুগে প্রচারের রোশনাই ছিল না। ছিল না বিজ্ঞাপনের চটকদারি। ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ছিল ভালবাসার সম্পর্ক। আর সেই ভালবাসা থেকেই বিক্রেতা ক্রেতাকে এই ফাউ দিতেন। পাশ্চাত্য চিন্তা-ধারায় বর্তমানে 'ফ্রী' নামক যে ফাউ দেওয়া হয় তা কি আদৌ ফাউ? হিসেব করলে দেখা যাবে রীতিমত ট্যাকের কড়ি গুনে সে ফাউ কিনতে হয়।

কী আর করা যাবে। 'ফ্রী' যখন আমাদের পিছন ছাড়বে না তখন উঠে পড়া যাক 'ফ্রী' নামক নাগরদোলায়। ফ্রী-র হাতছানিতে উপরে ওঠা আবার পরক্ষণেই বাজেটের বেসামাল অবস্থায় নীচে নামা। ওঠা আর নামা...। এইভাবেই ঘুরপাক খেতে খেতে দুহাত ভুলে কণ্ঠ মিলিয়ে সবাই বলি, "বল মা আমরা দাঁড়াই কোথায়"।

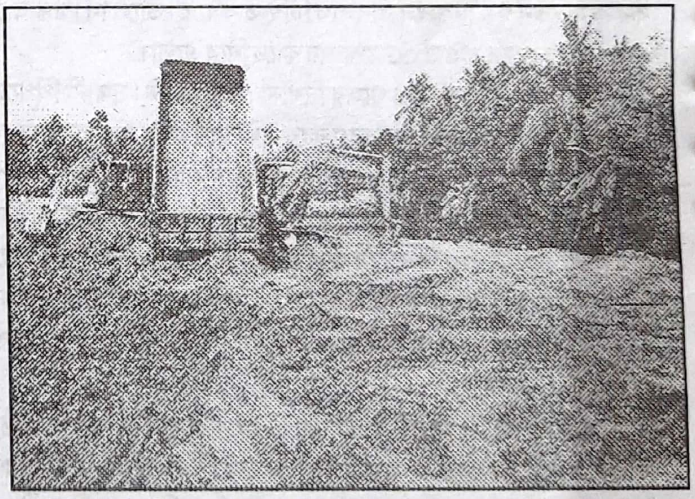

শিমুরালী চাঁদুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রহ্মপাড়া অঞ্চলের ২ বিঘা জলাশয়টি ভরাটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন সবুজ মঞ্চ চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, বিজ্ঞান দরবারের কর্মীরা। জলাশয়টি পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হয়েছে।

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩

সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)

E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in
bijnandarbar1980@gmail.com